بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ মোতাবেক ৩০ ফাতাহ্ ১৪০১ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্মৃতিচারণ শেষে আমি বলেছিলাম, বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ যদিও এখানে শেষ হলো, কিন্তু কতিপয় সাহাবী যাদের সম্পর্কে পূর্বে স্মৃতিচারণ করেছি তাঁদের সম্পর্কে কিছু তথ্য বা বিস্তারিত বিবরণ পরে হস্তগত হয়েছে। এগুলো হয় আমি কোনো এক সময় বর্ণনা করব নতুবা যখন এগুলো ছাপা হবে তখন তাতে সন্নিবেশিত হবে। অনেকে (আমাকে) লিখছেন, এসব ইতিহাস শুনে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। তাই এসব অংশও খুতবায় বর্ণনা করে দিন। এজন্য আমি সমীচীন মনে করেছি যে, এগুলোও কয়েকটি খুতবায় বর্ণনা করে দিই যেন এর মাধ্যমেও মানুষ এসব বিষয় অবগত হয়ে যায় এবং বেশি বেশি মানুষ (এটি) শুনতে পায়।

যাহোক, এ প্রসঙ্গে প্রথম স্মৃতিচারণ হলো **হযরত হামযা (রা.)'র**। তিনি মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন আর তাঁর (সা.) অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন যা মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন কথায় এবং হযরত হামযা (রা.)'র শাহাদতের পর মহানবী (সা.)-এর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এর মাঝে সংক্ষেপে কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তিও হতে পারে।

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, **হামযা নামটি মহানবী (সা.)-এর খুবই পছন্দের ছিল।** হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ রাযিআল্লাহ্ আনহুমা বর্ণনা করেন, আমাদের একজনের বাড়িতে পুত্রসন্তান জন্ম নিলে তিনি {মহানবী (সা.)-কে} জিজ্ঞেস করেন, আমরা তার কী নাম রাখব? মহানবী (সা.) বলেন, **এর নাম হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নামের সাথে মিলিয়ে রাখ যা আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দের নাম।** **(মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন লিলহাকেম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩১, কিতাব মা'রেফাতুস্ সাহাবাতি, হাদীস নংঃ ৪৮৮৮, রিয়াদের নিযারুল্ বায ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)**

হযরত হামযা (রা.)'র সহধর্মিনীগণ ও সন্তানসন্ততি সম্পর্কে তাবাকাতুল্ কুবরায় লেখা আছে, হযরত হামযা (রা.)'র একটি বিয়ে হয়েছিল অওস গোত্রের মিল্লাহ্ বিন মালেকের মেয়ের সাথে, যার গর্ভে ইয়ালা ও আমের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র ইয়ালার নামের কারণেই হযরত হামযা (রা.)'র ডাকনাম ছিল **'আবু ইয়ালা'**। হযরত হামযা (রা.)'র দ্বিতীয় স্ত্রী **হযরত খওলাহ্ বিনতে কায়েস** আনসারীয়া (রা.)'র গর্ভে তাঁর কন্যা **হযরত উমারাহ্** (রা.) জন্মগ্রহণ করেন যার নামের সাথে মিলিয়ে হযরত হামযা (রা.) নিজের ডাকনাম রেখেছিলেন **'আবু উমারাহ্'**। হযরত হামযা (রা.)'র আরেকটি বিয়ে করেন হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)'র বোন হযরত সালমা বিনতে উমায়েস (রা.)-কে, যার গর্ভে এক কন্যা হযরত উমামাহ্ (রা.)'র জন্ম হয়। ইনি সেই উমামাহ্ যার সম্পর্কে হযরত আলী, হযরত জা'ফর ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই হযরত উমামাহ্ (রা.)-কে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) হযরত জা'ফর বিন আবী তালেব (রা.)'র অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন, কেননা হযরত উমামাহ্ (রা.)'র খালা হযরত আসমা বিনতে উমায়েস রাযিআল্লাহু আনহুমা হযরত জা'ফর (রা.)'র সহধর্মিনী ছিলেন। হযরত হামযা (রা.)'র পুত্র ইয়ালার সন্তানদের মধ্যে ছিলেন উমারাহ্, ফযল, যুবায়ের, আকীল এবং মুহাম্মদ। কিন্তু তারা সবাই মারা যান। হযরত হামযা (রা.)'র কোনো সন্তানই জীবিত ছিলেন না, ফলে তাঁর বংশও বিস্তার লাভ করে নি। **(তাবাকাতুল্ কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬, বৈরুতের দ্বারুল্ ফিক্র থেকে প্রকাশিত)**

হযরত হামযা (রা.)'র কন্যা উমামাহ্ সম্পর্কে হযরত আলী, হযরত জা'ফর ও হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র মধ্যের যে দ্বন্দ্বের কথা মাত্রই উল্লেখ করা হলো তার বিশদ বিবরণ বুখারী শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত বারা বিন আযেব (রা.)'র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন যিলক্বদ মাসে উমরা করার পরিকল্পনা করেন তখন মক্কাবাসী তাঁকে (সা.) মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি (সা.) তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তিনি আগামী বছর মক্কায় উমরা করতে আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। যখন চুক্তিপত্র লেখা শুরু হয়, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, এগুলো সেই শর্ত যার ওপর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) চুক্তি করেছেন। মক্কাবাসীরা বলতে আরম্ভ করে, আমরা এটি মানি না। আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল (তাহলে) আপনাকে আমরা কখনোই বাধা দিতাম না বরং এখানে আপনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (লিখুন)। তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূলও এবং মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ও। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, রসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা.) বলেন, কখনোই মুছবো না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার উপাধী কখনোই মুছবো না। মহানবী (সা.) লিখিত কাগজটি নিয়ে নেন আর তিনি (সা.) ভালোমত লিখতে জানতেন না। তিনি (সা.) লিখেন, এগুলো সেই শর্ত যা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ নির্ধারণ করেছে। খাপবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোনো অস্ত্র মক্কায় আনা হবে না এবং মক্কাবাসীদের কেউ আমাদের সাথে যেতে চাইলেও তাকে সাথে নেওয়া হবে না। কিন্তু নিজের সঙ্গীদের মাঝ থেকে কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায় তাহলে তাকে বাধা দেয়া হবে না। যাহোক, চুক্তি অনুযায়ী তিনি (সা.) যখন পরের বছর মক্কায় প্রবেশ করেন এবং নির্ধারিত সময় পার হয়ে যায় তখন কুরাইশরা হযরত আলী (রা.)'র নিকটে এসে বলে, তোমার সাথি, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-কে বলো, এখন যেন তিনি এখান থেকে চলে যান, কেননা নির্ধারিত সময় পার হয়ে গিয়েছে। অতএব মহানবী (সা.) সেখান থেকে যাত্রা করেন। হযরত হামযা (রা.)'র কন্যা তাঁর পেছনে পেছনে আসছিলেন আর ডাকছিলেন হে চাচা! হে চাচা! হযরত আলী (রা.) গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন, তার হাত ধরেন এবং হযরত ফাতেমা (আ.)-কে বলেন, তোমার চাচার কন্যাকে নিয়ে নাও। তিনি তাকে বাহনে তুলে নেন। এরপর আলী, যায়েদ এবং জা'ফর (রা.) হামযার কন্যার বিষয়ে বিতর্ক করতে আরম্ভ করেন। আলী (রা.) বলেন, আমি তাকে এনেছি আর সে আমার চাচার কন্যা। জা'ফর (রা.) বলেন, সে আমার চাচার কন্যা আর তার খালা আমার স্ত্রী আর যায়েদ (রা.) বলেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা। অতঃপর মহানবী (সা.) তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন, সে তার খালার কাছে থাকবে আর একই সাথে বলেন, খালা মাতৃতুল্য। আবার আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি আমার আর আমি তোমার। এছাড়া জা'ফর (রা.)-কে বলেন, চেহারা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তুমি আমার সাথে সাদৃশ্য রাখো আর যায়েদ (রা.)-কে বলেন, তুমি আমার ভাই এবং বন্ধু। আলী (রা.) নিবেদন করেন, আপনি কি হামযার কন্যাকে বিয়ে করতে পারেন না? তখন তিনি (সা.) বলেন, **সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা এবং আমি তার চাচা।** **(সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব উমরাতুল কাযা, হাদীস নং: ৪২৫১)**

এসব ঘটনার মাধ্যমে এই ছোটোখাটো সমস্যা বা বিষয়েরও সমাধান হয়ে যায়। কখনো কখনো কাযা বা বিচার বিভাগে অভিযোগ আসে যে, খালার কাছে কেন যাবে? নানির কাছে কেন যাবে? অতএব এখানে (এ ঘটনার মাধ্যমে) এর সমাধান হয়ে গিয়েছে।

হযরত হামযা (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রওযুল উনুফ পুস্তকে লিখিত আছে, ইবনে ইসহাক ছাড়া কেউ কেউ হামযা (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি অতিরিক্ত কথা যোগ করেছেন। হযরত হামযা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আমি ক্রোধান্বিত হই আর আমি বলে বসি (অর্থাৎ তাঁর ক্রীতদাসীর কথার প্রেক্ষিতে যেসব ঘটনা ঘটে তা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে) আমি মহানবী (সা.)-

এর ধর্মে বিশ্বাস রাখি। পরে আমার অনুশোচনা হয় যে, আমি আমার পিতৃপুরুষ এবং জাতির ধর্ম ত্যাগ করেছি। উপরন্তু আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংশয় ও সন্দেহের মাঝে সারা রাত এমনভাবে অতিবাহিত করি যে, এক মুহূর্তের তরেও ঘুমাতে পারি নি। এরপর আমি কা'বাগৃহের কাছে আসি এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কাকুতিমিনতি করে দোয়া করি, (হে) আল্লাহ্! তুমি আমার বক্ষকে সত্যের জন্য উন্মুক্ত করে দাও আর আমার ভেতর থেকে সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দাও।

আমি দোয়া শেষ করার পূর্বেই মিথ্যা আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যায় এবং আমার হৃদয় দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এরপর সকালে আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে আমার সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করি তখন মহানবী (সা.) আমার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে অবিচলতা দান করেন। (রওযুল উনুফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪-৪৫, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)

হযরত আম্মার বিন আবু আম্মার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করেন, তাকে যেন জিব্রাঈল (আ.)-এর প্রকৃত রূপ দেখানো হয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাকে দেখার শক্তি বা সামর্থ্য তোমার নেই। তিনি নিবেদন করেন, কেন নেই? তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি দেখতেই চাও তাহলে নিজের জায়গায় বসে পড়। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর জিব্রাঈল (আ.) কাবাগৃহের সেই কাষ্ঠখণ্ডের ওপর অবতীর্ণ হন যেখানে মুশরিকরা তওয়াফ করার সময় নিজেদের কাপড়-চোপড় রাখত। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, নিজের চোখ তুলে তাকাও আর দেখো। **তখন তিনি তাকিয়ে দেখেন, তাঁর, অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ.)-এর দুই পা সবুজ যবরজদ এর (তথা মণির) মতো। অতঃপর তিনি অচেতন হয়ে পরে যান।** যবরজদ হলো একটি মূল্যবান পাথর, যেটি নীলকান্তমণির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে মহানবী (সা.) মুহাজিরদের একটি দলের সাথে মদীনা থেকে **'আবওয়া'** অভিমুখে যাত্রা করেন যাতে হযরত হামযা (রা.)ও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই অভিযানে মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত হামযা (রা.)ই বহন করেছিলেন যা ছিল সাদা রঙের। তিনি (সা.) তাঁর অনুপস্থিতিতে হযরত আবু সা'দ (রা.) অথবা অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। এই অভিযান যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায় নি, তবে বনু যামরাহ্র সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। **এটি প্রথম যুদ্ধ ছিল যাতে মহানবী (সা.) স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন।** এই যুদ্ধের আরেকটি নাম **ওয়াদ্দান**ও বটে। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪, ৩য় অধ্যায় ফী গাযওয়াতিল আবওয়া, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত)**

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, "দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে তরবারির যুদ্ধের অনুমতি নাযিল হয়। কেননা কুরাইশদের রক্তপাতের ষড়যন্ত্র এবং তাদের ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডের বিপরীতে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি (সা.) এই মাসেই মুহাজিরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার নামে মদীনা থেকে বের হন। যাত্রার পূর্বে তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন এবং মদীনা থেকে দক্ষিণ পশ্চিম অভিমুখে মক্কার পথে যাত্রা করেন এবং অবশেষে **ওয়াদ্দান** নামক স্থানে পৌঁছান। অত্রাঞ্চলে বনু যামরাহ্ গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। এই গোত্রটি বনু কিনানার একটি শাখা ছিল আর এভাবে তারা কুরাইশদের চাচাত ভাই ছিল। এখানে পৌঁছে মহানবী (সা.) বনু যামরাহ্ গোত্রের নেতার সাথে আলোচনা করেন এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে পরস্পরের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যার শর্তাবলী ছিল, বনু যামরাহ্ মুসলমানদের সাথে মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে সাহায্য করবে না। এছাড়া মহানবী (সা.) তাদেরকে

মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ডাকলে তারা দ্রুত চলে আসবে। অপর দিকে তিনি (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার করেন যে, মুসলমানরা বনু যামরাহ্ গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করবে। এই অঙ্গীকার যথারীতি লেখা হয় এবং উভয় পক্ষ তাতে স্বাক্ষর করেন। আর ১৫ দিনের অনুপস্থিতির পর তিনি (সা.) (মদীনায়) ফেরত আসেন। **'ওয়াদ্দানে'র** যুদ্ধের আরেকটি নাম **'আবওয়া'**র যুদ্ধও বটে। কেননা ওয়াদ্দানের নিকটেই আবওয়ার বসতিও রয়েছে আর এই স্থানেই মহনবী (সা.)-এর শ্রদ্ধেয়া মায়ের ইন্তেকাল হয়েছিল।" এটিই হচ্ছে সেই স্থান। "ঐতিহাসিকরা লিখেন, এই যুদ্ধে মহানবী (সা.) বনু যামরাহ্'র পাশাপাশি মক্কার কুরাইশদের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন। এর অর্থ হলো, তাঁর এ অভিযান ছিল মূলত কুরাইশের ভয়াবহ কর্কমাণ্ডকে বন্ধ করা আর এর বিষাক্ত ও ভয়াবহ প্রভাব দূর করার উদ্দেশ্যে ছিল যা কুরাইশদের কাফেলা প্রভৃতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে সৃষ্টি করছিল এবং যে কারণে মুসলমানদের অবস্থা সেই সময় ভীষণ স্পর্শকাতর হয়ে উঠছিল। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃ: ৩২৭-৩২৮}**

যাহোক, **হযরত হামযা (রা.) এ যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর পতাকা বহন করেছিলেন।**

দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে পুনরায় মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) মুহাজিরদের একটি দল নিয়ে, যাদের সংখ্যা দেড়শ' বা দু'শ বর্ণিত হয়েছে, মদীনা থেকে **'উশায়রাহ্'** অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বীয় দুধভাই আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদকে আমীর নিযুক্ত করেন। **এ যুদ্ধেও মহানবী (সা.)-এর সাদা রঙের পতাকা হযরত হামযা (রা.) বহন করেছিলেন।** এই যুদ্ধে তিনি (সা.) বহু পথ ঘুরে পরিশেষে সমুদ্র তীরের নিকটে **'ইয়াম্বু'**র নিকটস্থ **'উশায়রাহ্'** নামক স্থানে পৌঁছেন। তবে যদিও কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ হয় নি, কিন্তু তিনি (সা.) বনু মুদলিজ গোত্রের সাথে সেসব শর্তে চুক্তি করেন যেসব (শর্তে) বনু যামরাহ্ গোত্রের সাথে (চুক্তি) হয়েছিল এবং এরপর তিনি (সা.) ফিরে আসেন। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃ: ৩২৯}, (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭, ষষ্ঠ অধ্যায় ফী বয়ানি গাযওয়াতিল উশায়রাহ্, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত)**

বদরের যুদ্ধে একক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে তা পূর্বে বিভিন্ন হাদীসের বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিশদ বিবরণ এভাবে লিখেছেন যে,

"উভয় বাহিনী একেবারে পরস্পরের সম্মুখে ছিল তখন আল্লাহ্ তা'লার বিস্ময়কর হস্তক্ষেপে তখন সৈন্যদের দাঁড়ানোর বিন্যাস এমন ছিল যে, ইসলামী বাহিনী কুরাইশদের চোখে আসল সংখ্যার চেয়ে অধিক বরং দ্বিগুণ দেখাচ্ছিল। যে কারণে কাফিররা ভীতত্রস্ত হয়ে যায়। কিন্তু অপরদিকে কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী মুসলমানদের চোখে তাদের প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে স্বল্প দেখাচ্ছিল যার ফলে মুসলমানদের হৃদয় সাহসে পূর্ণ ছিল। কুরাইশরা কোনোভাবে মুসলিম বাহিনীর আসল সংখ্যা জানার চেষ্টা করছিল যাতে তাদের ভগ্ন হৃদয়কে প্রবোধ দিতে পারে। এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ নেতারা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে প্রেরণ করে যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনীর চতুর্দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখে আসো তাদের সংখ্যা কত? তাদের পিছনে কোনো সাহায্যকারী সেনাদল লুকিয়ে নেই তো? অতএব উমায়ের ঘোড়ায় চড়ে মুসলমানদের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু সে মুসলমানদের চেহারা ও অবয়বে এমন প্রতাপ, দৃঢ়তা এবং মৃত্যুর প্রতি এরূপ ভ্রুক্ষেপহীনতা দৃষ্টিগোচর হয় যে, সে প্রচণ্ড ভীত হয়ে ফিরে আসে এবং কুরাইশকে সম্বোধন করে বলে, যদিও আমি সাহায্যকারী কোনো সেনাবাহিনী দেখতে পাই নি, কিন্তু **হে কুরাইশের দল! আমি দেখেছি, মুসলমানদের বাহিনীতে উটনীর হাওদাগুলো নিজেদের ওপর মানুষ নয় বরং মৃত লাশ বহন করছে এবং মদীনার উষ্ট্রীগুলোয় যেন ধ্বংস আরোহণ করে আছে।** একথা শোনার পর কুরাইশদের হৃদয়ে এক প্রকার উৎকণ্ঠা ছেয়ে

যায়। সুরাকা, যে তাদের জামিন হয়ে এসেছিল সে এতটা ভয় পেয়েছিল যে, পালিয়ে ফিরে যায় আর মানুষ তাকে বাঁধা দিলে সে বলে, **আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা তোমরা দেখছ না।** হাকীম বিন হিযাম উমায়ের-এর মন্তব্য শুনে চিন্তিত হয়ে উতবাহ্ বিন রবীয়ার কাছে এসে বলে, **হে উতবাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আমর হাযরামী'র প্রতিশোধই তো চাচ্ছ!** (কেননা) সে তোমাদের মিত্র ছিল। এমন কি হতে পারে না যে, তুমি তার পক্ষ থেকে রক্তপণ পরিশোধ করবে আর কুরাইশদের নিয়ে ফিরে যাবে? এতে চিরকাল তোমার সুনাম থাকবে। উতবাহ্, যে নিজেই উদ্বিগ্ন ছিল (তার) আর কী চাওয়ার থাকবে, তাই সে ঝটপট বলে ওঠে, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই সম্মত আছি। সে বলে, দেখো হাকীম! দিনশেষে মুসলমান এবং আমরা পরস্পরের আত্মীয়ও বটে। এটি কি ভালো লাগে যে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে? তাই তুমি এখনই আবুল হাকাম, (অর্থাৎ আবু জাহলের) কাছে যাও এবং তার সামনে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করো। অপরদিকে উতবাহ্ স্বয়ং উটে আরোহণ করে নিজের পক্ষ থেকেই মানুষকে বোঝাতে আরম্ভ করে যে, আত্মীয়দের সাথে লড়াই করা সমীচীন নয়। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত আর মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দেয়া উচিত যেন সে অন্যান্য আরব গোত্রের সাথে তাঁর বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে থাকুক, ফলাফল যা-ই হোক না কেন দেখা যাবে। এছাড়া তোমরা দেখবে যে, মুসলমানদের সাথে লড়াই করাও কোনো সহজ কাজ নয়। কেননা (অযথাই) তোমরা আমাকে কাপুরুষ বলবে, অথচ আমি কাপুরুষ নই। তাদেরকে তো আমার কাছে মৃত্যুর দূত বলে মনে হয়। মহানবী (সা.) দূর থেকে উতবাহ্‌কে দেখে বলেন, কাফির বাহিনীর মধ্য থেকে কারো মাঝে যদি ভদ্রতা থেকে থাকে তাহলে তা এই লাল উটের আরোহীর মাঝে রয়েছে। তারা যদি তার কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের জন্য মঙ্গল হবে। কিন্তু যখন হাকীম বিন হিযাম আবু জাহলের কাছে আসে আর তার কাছে এই প্রস্তাব রাখে তখন উম্মতের সেই ফেরাউন এরূপ প্রস্তাবে কী আর সম্মত হয়? কথা শেষ হতেই সে বলে, আচ্ছা আচ্ছা, উতবাহ্ এখন তার সম্মুখে নিজের আত্মীয়দের দেখতে পাচ্ছে। এরপর সে আমর হাযরামীর ভাই আমের হাযরামীকে ডেকে বলে, তুমি কি শুনছ! তোমার মিত্র উতবাহ্ কী বলছে? আর তা-ও তখন যখনকিনা তোমার ভাইয়ের প্রতিশোধ (গ্রহণের সুযোগ) হাতের নাগালে রয়েছে। (একথা শুনে) আমের ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সে নিজের কাপড় ছিঁড়ে নগ্ন হয়ে (একথা বলে) চিৎকার করতে আরম্ভ করে যে, হায় পরিতাপ! আমার ভাই (তার হত্যার) প্রতিশোধ ছাড়াই রয়ে যাবে। হায় আক্ষেপ! আমার ভাই (তার হত্যার) প্রতিশোধ ছাড়াই রয়ে যাবে। এই মরুভূমির কান্না কুরাইশ সেনাদের বক্ষে শত্রুতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করে এবং যুদ্ধের দামামা পূর্ণ উদ্যমে বাজতে আরম্ভ করে।

যাহোক আবু জাহলের টিপ্পনী উতবাহ্‌র দেহমনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এই ক্রোধে পূর্ণ হয়ে সে তার ভাই শায়বা এবং নিজের পুত্র ওয়ালীদকে সাথে নিয়ে কাফির বাহিনীর সামনে এগিয়ে যায় এবং আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী একক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সম্মুখ সমরের আহ্বান জানায়। তখন আনসাররা তাদের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হতে চান। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, হামযা তুমি ওঠো, আলী তুমি ওঠো, উবায়দাহ্ তুমি ওঠো। তাঁরা তিনজনই মহানবী (সা.)-এর একান্ত নিকটাত্মীয় ছিলেন আর তিনি (সা.) চাচ্ছিলেন বিপদসঙ্কুল স্থানে সবার আগে তাঁর (সা.) আত্মীয়রা যেন এগিয়ে যায়। অপরদিকে উতবাহ্ প্রমুখও আনসারদের দেখে বলে ওঠে, এদেরকে আমরা চিনি না, আমাদের সমপর্যায়ের লোক আমাদের সামনে আসুক। অতএব হামযা, আলী এবং উবায়দাহ্ (রা.) অগ্রসর হন। আরবের রীতি অনুযায়ী প্রথমে পরিচয় হয়। অতঃপর উবায়দাহ্ বিন মুত্তালিব (রা.) ওয়ালীদের মুখোমুখি হন আর হামযা (রা.) উতবাহ্‌র এবং আলী (রা.) শায়বার (মুখোমুখি হন)। হামযা এবং আলী (রা.) দু'একটি আঘাতেই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে

ভূপাতিত করেন বা হত্যা করেন। কিন্তু উবায়দাহ্ (রা.) এবং ওয়ালীদের মাঝে দু'চারটি জোরালো আক্রমণ হয় আর অবশেষে উভয়েই একে অপরের হাতে গুরুত্র আহত হয়ে পড়ে যায়। তখন হামযা এবং আলী (রা.) দ্রুত অগ্রসর হয়ে ওয়ালীদকে হত্যা করেন আর উবায়দাহ্ (রা.)-কে তুলে নিজেদের শিবিরে নিয়ে আসেন। কিন্তু উবায়দাহ্ (রা.) এই আঘাতের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেন নি এবং বদর থেকে প্রত্যাবর্তণের সময় পতিমধ্যে ইন্তেকাল করেন।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃ: ৩৫৮-৩৬০}**

হযরত হামযা (রা.) বদরের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা তুয়ায়মাহ্ বিন আদীকেও হত্যা করেছিলেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবঃ কিস্সাহ্ গযওয়াতু বদরিন)**

বদরের যুদ্ধের সময়কার একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত হামযা (রা.) মাতাল অবস্থায় হযরত আলী (রা.)'র উটনীগুলোকে হত্যা করেছিলেন। এটি মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন বর্ণনাকারী রয়েছেন, হযরত আলী বিন হোসাইন (রা.) তার পিতা হোসেইন বিন আলী রাযিআল্লাহ্ আনহুমার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধের সময় আমি একটি পূর্ণ বয়স্কা উটনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে লাভ করি এবং আরেকটি উটনী মহানবী (সা.) আমাকে দান করেন। একদিন এক আনসারী সাহাবীর দরজার কাছে এ দু'টিকে আমি এ উদ্দেশ্যে বেধে রেখেছিলাম যে, এগুলোর পিঠে **আসখার** (এক প্রকার ঘাস যা স্বর্ণকারেরাও ব্যবহার করে থাকে, সুগন্ধি ঘাস) চাপিয়ে নিয়ে যাব। বনু কায়নুকার একজন স্বর্ণকারও আমার সাথে ছিল। আমি চিন্তা করেছিলাম, এখান থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে হযরত ফাতেমা (রা.) যার সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছিলাম তাঁর বৌভাত করব। হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) সেই আনসারীর বাড়িতে মদ্যপান করছিলেন তাদের সাথে একজন গায়িকাও ছিল। সে যখন এই পঙতিটি পড়ে যে, হে হামযা! উঠো আর স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়সী উটের দিকে অগ্রসর হও। একথা শুনে হযরত হামযা (রা.) আবেগের বশে তরবারি নিয়ে উঠেন এবং দু'টি উটনীরই কুঁজ কেটে ফেলেন এবং সেগুলোর পেট চিড়ে কলিজা বের করে নেন। ইবনে জুরায়েজ বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করি, কুঁজের মাংসও কি কেটে ফেলেছিল? তিনি বলেন, এ দুটির কুঁজও কেটে ফেলেন এবং সেগুলো (তিনি) নিয়ে যান। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এটি দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তখন তাঁর কাছে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে এ ঘটনা অবগত করলে তিনি (সা.) (ঘটনাস্থলে) আসেন। যায়েদ (রা.)ও তাঁর সাথেই ছিলেন আর আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র কাছে গিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলে হযরত হামযা (রা.) চোখ তুলে তাকান। {তিনি (রা.) নেশাগ্রস্থ ছিলেন।} আর মহানবী (সা.)-কেও {তিনি (রা.)} বলেন, তোমরা সবাই আমার পিতৃপুরুষের দাস। ফলে মহানবী (সা.) সেখান থেকে ফেরত চলে আসেন। এটি মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ মুসাকাত, বাবু বায়উল্ হাতাবি ওয়াল্ কালাই, হাদীস নং: ২৩৭৫)**

তিনি (সা.) বলেন, এ অবস্থায় তার সাথে কথা না বলাই শ্রেয়। কিন্তু দেখুন! পরবর্তীতে **মদ্যপান হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার পর এসব লোক এর ধারেকাছেও ভিড়েন নি। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মানার ক্ষেত্রে সাহাবীদের মানদণ্ড এমন ছিল যে, তৎক্ষণাৎ (মদের) মটকা ভেঙে ফেলেন।** **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল্ উশরেবাহ্, বাবু তাহরীমুল্ খামর ... হাদীস নং: ৫১৩৮)**

একথা বলেন নি যে, আমরা ধীরে ধীরে নেশার বদভ্যাস ছেড়ে দিব, যেমনটি বর্তমান যুগের লোকেরা বলে। প্রথমত নেশায় অভ্যস্ত হয়ে যায় যা এমনিতেই অন্যায় কাজ এবং ইসলামে নিষিদ্ধ, এরপর বলে; আমাদেরকে সময় দেয়া হোক, আস্তে আস্তে ছেড়ে দিব। যাহোক, এটি একটি ঘটনা

যা তখন ঘটেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর কুরবানীর মানও বাড়তে থেকেছে। নিশ্চিতরূপে হযরত হামযা (রা.) কী বলেছিলেন (তা ভেবে) পরবর্তীতে লজ্জিতও হয়ে থাকবেন।

বদরের যুদ্ধের পর যখন বনু কায়নুকার অভিযান সংঘটিত হয়েছিল তখন এতেও হযরত হামযা (রা.) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ যুদ্ধেও মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত হামযা (রা.)ই বহণ করেছিলেন। এ পতাকাটি সাদা রঙের ছিল। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮০, দ্বাদশ অধ্যায় ফী গাযওয়াতি বনী কায়নুকাহ্, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত)**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিশদ বিবরণ এভাবে লিখেছেন যে, "মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন মদীনায় ইহুদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করতো। তাদের নাম হলো বনু কায়নুকা, বনু নযীর ও বনু কুরায়যা। মহানবী (সা.) মদীনায় আসার পর পরই এসব গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং পরস্পরের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সাথে বসবাসের ভিত রচনা করেন। চুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় পক্ষই এ বিষয়ের জিম্মাদার ছিল যে, মদীনায় তারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে আর যদি কোনো বহিরাগত শত্রু মদীনার ওপর আক্রমণ করে তাহলে সবাই মিলে তাদের প্রতিহত করবে। প্রথমদিকে ইহুদীরা এই চুক্তি মেনে চলে এবং কমপক্ষে বাহ্যত মুসলমানদের সাথে তারা কোনো বিবাদ সৃষ্টি করে নি। কিন্তু **যখন তারা লক্ষ্য করল যে, মুসলমানরা মদীনায় অধিক ক্ষমতাধর হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে থাকে। ফলে তারা মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার সংকল্প করে। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তারা বৈধ-অবৈধ সকল পন্থা অবলম্বন করতে আরম্ভ করে।** এমনকি মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে নি। যেমনটি রেওয়ায়েত এসেছে, একবার অওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেক লোকজন একত্রে বসে পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে গল্পগুজব করছিলেন, তখন কতিপয় কুচক্রী ইহুদী এই বৈঠকে এসে **বুআসের যুদ্ধ** সম্পর্কে আলোচনা করতে আরম্ভ করে। এটি সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ছিল যা হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে এই দুই গোত্রের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এবং যাতে অওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেক মানুষ পরস্পরের হাতে নিহত হয়েছিল। এই যুদ্ধের কথা উঠতেই কতক আবেগপ্রবণ মানুষের হৃদয়ে পুরোনো স্মৃতি জাগ্রত হয় এবং পুরোনো শত্রুতার চিত্র তাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা ও বিদ্রুপের পর্যায় পেরিয়ে বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, এই বৈঠকেই মুসলমানরা পরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, মহানবী (সা.) যথাসময় এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন এবং মুহাজিরদের একটি দল নিয়ে তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হন আর উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠান্ডা করেন। এরপর {তিনি (সা.)} তাদের ভর্ৎসনাও করেন যে, আমার বর্তমানেই তোমরা অজ্ঞতার রীতি অবলম্বন করছ আর খোদার এই নিয়ামতের মুল্যায়ন করছ না যে, ইসলামের মাধ্যমে তিনি তোমাদের (পরস্পরকে) ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন? আনসারদের ওপর মহানবী (সা.)-এর এই উপদেশের এতটা প্রভাব পড়ে যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝড়তে থাকে এবং তাদের এই আচরণের জন্য তারা তওবা করে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন।

যখন বদরের যুদ্ধ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় মুসলমানদের সংখ্যার স্বল্পতা ও তাদের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও কুরাইশদের এক বিরাট যুদ্ধংদেহী সেনাদলের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেন আর মক্কার বড় বড় নেতারা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন **মদীনার ইহুদীদের (হৃদয়ে সুপ্ত) বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় আর তারা মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্যে ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হতে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে থাকে যে, কুরাইশ সেনাদলকে পরাস্ত করাটা কী এমন বড় বিষয় ছিল! আমাদের সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর লড়াই হলে**

আমরা বুঝিয়ে দিব যুদ্ধ কীভাবে করতে হয়। এমনকি এক বৈঠকে তারা স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর মুখের ওপর এধরণের কথা বলে বসে। অতএব, রেওয়ায়েত রয়েছে; বদরের যুদ্ধের পর মদীনায় ফিরে এসে মহানবী (সা.) একদিন ইহুদীদের একত্র করে তাদের উপদেশ প্রদান করেন এবং নিজের দাবি উত্থাপন করে (তাদেরকে) ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর (সা.) এই শান্তি ও সহানুভূতিপূর্ণ ভাষণের উত্তরে ইহুদী নেতারা বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি হয়তো গুটিকয়েক কুরাইশকে হত্যা করে দাম্ভিক হয়ে গিয়েছ। তারা তো রণকৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। আমাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হলে তুমি বুঝতে পারবে, যুদ্ধবাজরা কেমন হয়! ইহুদীরা শুধু মৌখিক হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বরং (পরিস্থিতি বিবেচনায়) মনে হয়, তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করতে শুরু করেছিল। কেননা রেওয়ায়েত রয়েছে, সেই দিনগুলোতে তালহা বিন বারা নামের একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী মৃত্যুর প্রাক্কালে ওসীয়্যত করেন, আমি যদি রাতের বেলা মারা যাই তাহলে মহানবী (সা.)-কে যেন জানাযার নামাযের জন্য অবগত না করা হয়। পাছে এমন কিছু যেন না হয়ে যায় যে, আমার কারণে মহানবী (সা.)-এর ওপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে কোনো আক্রমণ হয়ে যায়। মোটকথা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীরা প্রকাশ্যে দুষ্কৃতি করতে আরম্ভ করে আর যেহেতু মদীনায় ইহুদীদের মধ্যে বনু কায়নুকা গোত্র সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সাহসী ছিল তাই সর্বপ্রথম তাদের পক্ষ থেকেই চুক্তিভঙ্গের সূচনা হয়। কাজেই ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, ... মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনু কায়নুকাহ্ সর্বপ্রথম এই চুক্তিভঙ্গ করে যা তাদের এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল আর বদরের (যুদ্ধের) পর তারা অনেক বেশি বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করে আর প্রকাশ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং সন্ধি ও চুক্তি ভঙ্গ করে।

কিন্তু এতকিছুর পরও মুসলমানরা আপন মনিবের নির্দেশনাধীনে থেকে সর্বপ্রকার ধৈর্যধারণ করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে আগ বাড়িয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। বরং **হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীদের সাথে সংঘটিত এই চুক্তির পর মহানবী (সা.) বিশেষভাবে ইহুদীদের মনস্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখতেন।** যেমন, একবার এক মুসলমান ও এক ইহুদীর মাঝে কিছু মতভেদ হয়। (সেই) ইহুদী হযরত মূসা (আ.)-কে সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। এতে (সেই) সাহাবী রেগে যান এবং তিনি সেই ইহুদীর সাথে কিছুটা কঠোর আচরণ করেন আর মহানবী (সা.)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল বলে উল্লেখ করেন। মহানবী (সা.) যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং সেই সাহাবীকে ভর্ৎসনা করে বলেন, খোদার রসূলদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কাজ তোমার নয়। এরপর তিনি (সা.) হযরত মূসা (আ.)-এর কোনো একটি আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে ইহুদীর মনস্তুষ্টি করেন। কিন্তু মনস্তুষ্টির এমন উন্নত আচরণ সত্ত্বেও ইহুদীরা তাদের দুষ্কৃতিতে আরো ধৃষ্ট হতে থাকে এবং অবশেষে স্বয়ং ইহুদীদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধের উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয় এবং তাদের মনের শত্রুতা ও বিদ্বেষ তারা আর তাদের বুকে চেপে রাখতে পারে নি আর এটি যেভাবে ঘটেছে তা হলো, একজন মুসলমান নারী বাজারে কোনো এক ইহুদীর দোকানে কিছু সামগ্রী ক্রয় করতে যায়। কতিপয় দুষ্ট ইহুদী, যারা তখন সেই দোকানে বসে ছিল তারা চরম অসভ্যের মতো সেই নারীকে উত্ত্যক্ত করে। এছাড়া দোকানদার নিজেও এমন দুষ্টামি করে যে, সে ঐ মহিলার পেটিকোটের নিচের অংশের কোণা তার অজান্তে কোনো কিলক বা কাঁটা দিয়ে সাথে তার পিঠের কাপড়ের সাথে আটকে দেয়। এর ফলে সেই নারী যখন তাদের উশৃঙ্খল ও অসভ্য আচরণ দেখে সেখান থেকে উঠে চলে যেতে উদ্যত হয় তখন সে নগ্ন হয়ে যায়। তখন সেই ইহুদী দোকানদার এবং তার সঙ্গীসাথিরা সজোরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর হাসতে থাকে। **মুসলমান নারী লজ্জায় একটি চিৎকার দিয়ে সাহায্যের আহ্বান জানায়। ঘটনাচক্রে একজন মুসলমান তখন নিকটেই উপস্থিত ছিল। সে দৌড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছে আর পরস্পর লড়াইয়ের ফলে ইহুদী**

দোকানদার নিহত হয়। এরফলে চতুর্দিক থেকে সেই মুসলমানের ওপর তরবারির আঘাত হতে থাকে আর সেই আত্মাভিমানী মুসলমান সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করে। মুসলমানরা যখন এ ঘটনা জানতে পারে তখন সাম্প্রদায়িক আত্মাভিমানে তাদের মাঝেও চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর অপরদিকে ইহুদীরা যারা এ ঘটনাকে যুদ্ধের একটি উসিলা বানাতে চেয়েছিল সমবেতভাবে একত্র হয় আর একটি দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি বনু কাইনুকার নেতৃবর্গকে সমবেত করে বলেন, এই রীতি ভালো নয়, তোমরা এমন অনিষ্ট থেকে বিরত হও আর খোদাকে ভয় করো। তারা কোনোরূপ সমবেদনা ও অনুতাপ প্রকাশ না করে এবং ক্ষমাপ্রার্থী না হয়ে উল্টো প্রকাশ্যে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর দেয় আর সেই একই হুমকির পুনরাবৃত্তি করে যে, বদরের বিজয়ের বড়াই কোরো না, আমাদের সাথে যখন মোকাবিলা হবে তখন টের পাবে, যোদ্ধা কাকে বলে? উপায়ন্তর না দেখে তিনি (সা.) সাহাবীদের একদলকে সাথে নিয়ে বনু কাইনুকার দুর্গসমূহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখনো তাদের শেষ সুযোগ ছিল, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করার কিন্তু তা না করে তারাও সম্মুখ সমরে উদ্যত হয়। **মোটকথা, যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে ওঠে আর ইসলাম ও ইহুদীদের শক্তিমত্তা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ে।** সেযুগের প্রথা অনুসারে এটিও যুদ্ধের একটি রীতি ছিল যে, একপক্ষ নিজেদের দুর্গে সুরক্ষিত বসে থাকতো আর অবরুদ্ধ হয়ে যেত। অপরপক্ষ দুর্গকে অবরোধ করে রাখতো আর এরপর সুযোগ বুঝে পরস্পরের ওপর আক্রমণ করতো। অবশেষে হয় অবরোধকারী সৈন্যরা দুর্গ করায়ত্ব করে নিত বা নিরাশ হয়ে অবরোধ তুলে নিত আর এভাবে অবরুদ্ধদের জয় ধরে নেয়া হতো। কিংবা অবরুদ্ধরা অবরোধের চাপ সহ্য করতে না পেরে দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে নিজেদেরকে বিজয়ীদের হাতে সমর্পণ করে দিত। এক্ষেত্রেও বনু কাইনুকা' এ রীতিই অবলম্বন করে এবং নিজেদেরকে দুর্গে আবদ্ধ করে দুর্গে অবস্থান নেয়। মহানবী (সা.) তাদেরকে অবরুদ্ধ করেন আর লাগাতার ১৫দিন পর্যন্ত এ অবরোধ চলতে থাকে।

অবশেষে বনু কাইনুকা'র সকল শক্তি ও দাম্ভিকতার যখন পতন ঘটে তখন তারা এই শর্তে নিজেদের দুর্গগুলোর ফটক খুলে দেয় যে, মুসলমানরা তাদের ধন-সম্পদের মালিক হবে কিন্তু তাদের প্রাণ এবং পরিবার পরিজনের ওপর মুসলমানদের কোনো অধিকার থাকবে না। মহানবী (সা.) এ শর্ত মেনে নেন। এর কারণ হলো, যদিও মূসায়ী শরীয়ত অনুযায়ী এরা সবাই হত্যাযোগ্য ছিল আর চুক্তি অনুযায়ী এদের ওপর মূসায়ী শরীয়তের সিদ্ধান্তই প্রয়োগ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটি যেহেতু এই জাতির প্রথম অপরাধ ছিল আর কৃপা ও দয়ার সাগর মহানবী (সা.)-এর প্রকৃতিও যেহেতু চূড়ান্ত শাস্তি প্রদানের প্রতি প্রথমেই সম্মত ছিল না যা শেষ পদক্ষেপ হয়ে হয়ে থাকে আবার অন্যদিকে এমন চুক্তিভঙ্গকারী ও শত্রু গোত্রের মদীনায় থাকাও আস্তীনে সাপ পোষার নামান্তর ছিল; বিশেষত (এমন অবস্থায় যখন) অওস ও খাজরায গোত্রের একটি মুনাফিক গোষ্ঠি পূর্ব থেকেই মদীনায় অবস্থান করছিল; অধিকন্তু বাইরের দিক থেকেও সমগ্র আরবের বিরোধিতা মুসলমানদের বিচলতি করে রেখেছিল; **এমতাবস্থায় মহানবী (সা.)-এর এই সিদ্ধান্ত দেয়াই সমুচিত ছিল যে, বনু কাইনুকা' মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। এই শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় এবং সে যুগের অবস্থার নিরিখে খুবই লঘু শাস্তি ছিল।** মূলত এতে কেবল আত্মরক্ষার বিষয়টিই দৃষ্টিপটে ছিল। অন্যথায় আরবের বেদুঈন জাতির কাছে বাসস্থান পরিবর্তন করা বড় কোনো কঠিন বিষয় নয়; বিশেষকরে যখন কোনো গোত্রের ধনসম্পদ– জমিজমা ও বাগবাগিচারূপে না থাকে, যেমনটি বনু কাইনুকা'র ছিল না; অধিকন্তু গোত্রের সকল সদস্যের যখন পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি গড়ার সুযোগও লাভ হবে। অতএব বনু কাইনুকা' প্রশান্ত চিত্তে মদীনা ছেড়ে সিরিয়া অভিমুখে চলে যায়। তাদের যাত্রা করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব মহানবী (সা.)

তাঁর সাহাবী উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.)'র প্রতি অর্পণ করেছিলেন, তিনি তাদের একজন মিত্র ছিলেন। অতএব উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.) কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত বনু কাইনুকা'র সাথে যান এবং পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে সম্মুখে যাত্রা করিয়ে ফিরে আসেন। গণিমতের মাল হিসাবে শুধু যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধসামগ্রী এবং স্বর্ণকারদের কারিগরী কিছু যন্ত্রপাতি মুসলমানদের হস্তগত হয়।

বনু কাইনুকা' সম্পর্কে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন তারা তাদের দুর্গগুরোর ফটক খুলে নিজেদেরকে মহানবী (সা.)-এর হাতে সমর্পণ করে দেয়। তখন তাদের চুক্তিভঙ্গ, বিদ্রোহ এবং দুষ্কৃতির কারণে তিনি (সা.) তাদের যুদ্ধবাজ পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড দিতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের সুপারিশে তিনি (সা.) এই সংকল্প পরিত্যাগ করেন। (কিন্তু একথার কোনো প্রমাণ নেই।) হাদীস বিশারদরা এই রেওয়ায়েতকে সঠিক বলে মনে করেন না। কেননা অন্যান্য রেওয়ায়েতে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের এবং তাদের পরিবার পরিজনের প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার শর্তে রাজি হয়ে বনু কাইনুকা' ফটক খুলে দিয়েছিল। তাই মহানবী (সা.) এই শর্ত মেনে নেয়ার পর অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে তাদের হত্যা করার চেষ্টা করবেন– এটা হতেই পারে না। তাই এটি একেবারে ভিত্তিহীন কথা। যদিও বনু কাইনুকা'র পক্ষ থেকে প্রাণ ভিক্ষার শর্ত উপস্থাপন করা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, তারা নিজেরাও মনে করতো মৃত্যুদণ্ডই তাদের প্রকৃত শাস্তি। কিন্তু তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট দয়া ভিক্ষা চায়। আর তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি নেয়ার পর তারা তাদের দুর্গের ফটক খুলতে চেয়েছিল। কিন্তু যদিও মহানবী (সা.) স্বীয় দয়ালু প্রকৃতির কারণে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তথাপি বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে এরা তাদের দুষ্কর্ম এবং অপরাধের কারণে ধরাপৃষ্ঠে জীবিত থাকার যোগ্য ছিল না। যেমনটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, দেশান্তরিত হয়ে এরা যে অঞ্চলে গিয়েছিল সেখানে তাদের এক বছরও অতিবাহিত হয় নি আর তাদের মাঝে এমন এক রোগের সংক্রমণ হয় যাতে পুরো গোত্র আক্রান্ত হয়ে মাটিতে মিশে যায়। {হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃঃ ৪৫৭-৪৬১} ধ্বংস হয়ে যায়। বনু কাইনুকা'র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে। {হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃঃ ৪৬১} যাহোক, হযরত হামযা উক্ত যুদ্ধে পতাকাবাহী ছিলেন।

হযরত হামযা (রা.)'র শাহাদত সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এই (শাহাদতের) সংবাদ পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নযোগে মহানবী (সা.)-কে প্রদান করেছিলেন। অতএব, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন, তিনি (সা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি একটি মেষের পিছু ধাওয়া করছি আর আমার তরবারির ফলা ভেঙে গেছে। আমি এই স্বপ্নের যে তা'বীর করেছি তা হলো, (কাফির) জাতির মেষ বা ভেড়াকে আমি হত্যা করব, অর্থাৎ তাদের সেনাপতিকে (হত্যা করব) আর আমি তরবারির ফলা (ভাঙার) তা'বীর করেছি, আমার বংশের কোনো এক ব্যক্তি (নিহত হবে)। এরপর হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করা হয় আর মহানবী (সা.) মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহাকে হত্যা করেন। (মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন লিলহাকেম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩৪, কিতাব মা'রেফাতুস্ সাহাবাতি, হাদীস নং: ৪৮৯৬, রিয়াদের নিযারুল্ বায ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)

হযরত হামযা (রা.)'র 'মুসলা' বা চেহারা বিকৃত করা হয়েছিল, নাক-কাট কেটে ফেলা হয়েছিল, তাঁর পেট চিরে ফেলা হয়েছিল। তাঁর এই অবস্থা দেখার পর মহানবী (সা.) খুবই ব্যথিত হন আর বলেন, কুরাইশের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ আমাকে বিজয় দান করলে আমি তাদের ৩০ জন ব্যক্তির 'মুসলা' করব। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) শপথ করে বলেন, আমি তাদের ৭০

জনের ‘মুসলা’ করব। এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (সূর আন্ নাহল: ১২৭) অর্থাৎ তোমরা শাস্তি দিতে চাইলে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো তবে ধৈর্যশীলদের জন্য এটিই উত্তম। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি ধৈর্যধারণ করব এবং তিনি তাঁর শপথের জন্য কাফ্ফারা প্রদান করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **গত রাতে আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করি {তিনি (সা.) স্বপ্নে একটি দৃশ্য দেখেন} তখন আমি দেখি জা'ফর ফিরিশ্তাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে আর অপরদিকে হামযা সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে আছে।** **(মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন লিলহাকেম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩২, কিতাব মা'রেফাতুস্ সাহাবাতি, হাদীস নং: ৪৮৯০, রিয়াদের নিযারুল্ বায ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)**

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) উহুদের দিন হযরত হামযা (রা.)'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তাঁর নাক ও কান কেটে ফেলা হয়েছিল এবং ‘মুসলা’ করা হয়েছিল। এটি দেখে {তিনি (সা.)} বলেন, আমার যদি সাফিয়ার দুঃখবেদনার চিন্তা না থাকতো তাহলে আমি তাঁকে এভাবেই ছেড়ে দিতাম এমনকি আল্লাহ্ তাঁকে পশুপাখির পেট থেকেই উত্থিত করতেন। এরপর তাঁকে (রা.) এক চাদরে কাফন দেয়া হয়। **(মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন লিলহাকেম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩১, কিতাব মা'রেফাতুস্ সাহাবাতি, হাদীস নং: ৪৮৮৭, রিয়াদের নিযারুল্ বায ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)**

হযরত হামযা (রা.)'র শাহাদত ও লাশ দেখে মহানবী (সা.)-এর আবেগের বহিঃপ্রকাশ এবং ধৈর্যধারণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কেবল নিজেই করেন নি বরং হযরত হামযা (রা.)'র বোন এবং নিজের ফুপুকেও এতে বাধ্য করার বিষয়ে পূর্বেও কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছিল। এরপর রয়েছে মাতমকারী আনসারী মহিলাদের মাতম করা থেকে বিরত রাখার ঘটনা। এই ঘটনাটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার খিলাফতের পূর্বের সালানা জলসার এক বক্তৃতায় বর্ণনা করেছিলেন। তা আমিও উল্লেখ করছি যাতে মহানবী (সা.)-এর মহান চারিত্রিক গুণ সম্বন্ধেও অবগত হওয়া যায়। যাহোক, এখানে এটি বর্ণনা করা যথোচিত হবে। পূর্বে তো বিভিন্ন হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি (রাহে.) বলেন, হযরত হামযা (রা.)'র প্রতি মহানবী (সা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ এই বাক্যের মাধ্যমে ঘটে যা উহুদের (যুদ্ধের দিন) সন্ধ্যায় মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র শবদেহের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, হে হামযা! আজ আমার যে রাগ হচ্ছে আর তোমার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আমি যে কষ্ট পাচ্ছি আগামীতে আল্লাহ্ কখনোই আমাকে এমন কষ্টের (দৃশ্য) দেখাবেন না। সে সময় হযরত হামযা (রা.)'র বোন (এবং) তাঁর (সা.) ফুপু হযরত সাফিয়া (রা.)ও এ সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন। তখন তাঁর (রা.) ধৈর্যের বাধ না আবার ভেঙে যায়– এই শঙ্কায় প্রথমে তিনি (সা.) তাঁকে মরদেহ দেখার অনুমতি দেন নি। কিন্তু তিনি (রা.) ধৈর্যধারণের প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি (সা.) অনুমতি দিয়ে দেন। যাহোক, তিনি (রা.) হযরত হামযা (রা.)'র লাশের পাশে এসে উপস্থিত হন আর খোদা ও রসূলের সিংহ নিজ প্রিয় ভাইয়ের মৃতদেহ এ অবস্থায় সামনে পড়ে থাকতে দেখেন যে, অত্যাচারীরা বুক চিরে কলিজা বের করে নিয়েছিল এবং চেহারা পুরোপুরি বিকৃত করে ফেলেছিল। যদিওবা দুঃখে সবার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল কিন্তু হযরত সাফিয়া (রা.) ধৈর্যধারণের প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকেন এবং অধৈর্যের একটি শব্দও মুখ থেকে বের হতে দেন নি। কিন্তু অশ্রু থামানোর ক্ষমতা কারো আছে কি? ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করেন এবং কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই বসে পড়েন। অবস্থা এমন ছিল যে, দুঃখভারাক্রান্ত নীরব চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে চলছিল। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.)ও পাশেই বসে পড়েন। তাঁর

(সা.) চোখ থেকেও অবলীলায় অশ্রু বইতে থাকে। হযরত সাফিয়ার (রা.) অশ্রু ঝড়ায় ভাটা পড়লে হুযূর (সা.)-এর অশ্রুতেও ভাটা পড়ত। আবার হযরত সাফিয়া (রা.)'র অশ্রু ঝড়া বেড়ে গেলে মহানবী (সা.)-এর অশ্রু প্রবাহও বৃদ্ধি পেত। কয়েক মিনিট এভাবেই অতিবাহিত হয়। অতএব **মহানবী (সা.) এবং আহলে বায়তের শোকপালন এই অল্পক্ষণের নীরব অশ্রু বিসর্জন ছাড়া আর কিছুই ছিল না আর এটাই সুন্নতে নববী (সা.)**। তিনি (সা.) মদীনাতে এমন অবস্থায় প্রবেশ করেন যখন গোটা মদীনা শোকের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। আর প্রত্যেক বাড়ি থেকে উহুদের শহীদদের স্মরণে বিলাপকারীদের আর্তনাদ উচ্চকিত হচ্ছিল। হুযূর (সা.) (তা) শুনে অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে বলেন, হামযার জন্য কি কাঁদার কেউ নেই, অবশ্য হামযার জন্য কাঁদার কেউ থাকবেই বা কীভাবে? আহলে বায়তকে তো সকাল সন্ধ্যা ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়া হতো। মহানবী (সা.)-এর এই বেদনাভরা কথা যখন কিছু আনসার শুনতে পান তখন আবেগাপ্লুত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে যান আর স্ত্রীদের নির্দেশ দেন, অন্য সবার জন্য বিলাপ করা বাদ দাও এবং হামযা (রা.)'র জন্য বিলাপ করো। (এরপর) দেখতে দেখতে সবদিক থেকে হামযা (রা.)'র জন্য আহাজারি ও কান্নার রোল শুরু হয়ে যায় আর প্রতিটি বাড়ি হামযার বিলাপে দুঃখপুরীতে পরিণত হয়।

আনসারী মহিলারা বিলাপ করতে করতে এবং অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে মহানবী (সা.)-এর বাড়ির সামনে সমবেত হয়। শোরগোল শুনে মহানবী (সা.) বাইরে বেরিয়ে দেখেন আনসারী মহিলাদের ভিড় লেগে আছে। হুযূর (সা.) তাদের সহানুভূতির জন্য তাদের জন্য দোয়া করেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু একই সাথে বলেন, মৃতদের জন্য বিলাপ করা বৈধ নয়। অতএব সেদিন থেকে বিলাপ করার প্রথা বন্ধ করা হয়। মহানবী (সা.)-এর পদতলে আমাদের প্রাণ নিবেদিত হোক। কী চমৎকার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর শিক্ষক ছিলেন (তিনি) যিনি আধ্যাত্মিকতার ঊর্ধ্বলোক থেকে আমাদেরকে ধর্ম শেখানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। এই উপদেশদাতা কতটা দূরদর্শী ও মেধাবী ছিলেন যার দৃষ্টি মানব প্রকৃতির অতল গহীন পর্যন্ত অবতরণ করত! ওই সময় মহানবী (সা.) যদি আনসারী মহিলাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করতেন যখন তারা নিজেদের শহীদদের জন্য বিলাপ করছিল, তাহলে হয়তো কারো কারো জন্য এটি মনোকষ্টের কারণ হতো আর এ ধৈর্যধারণ তাদের জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে যেত। কিন্তু দেখুন! কেমন প্রজ্ঞার সাথে তিনি প্রথমে তাদের বিলাপের মোড় নিজের চাচা হামযা (রা.)'র দিকে ঘুরিয়েছেন। কিন্তু যখন বিলাপ করতে বারণ করেন তখন তিনি নিজের চাচার জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেন।

আল্লাহ্‌র মনোনয়ন তো আল্লাহ্‌র মনোনয়নই হয়ে থাকে। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা নিজের বান্দাদের জন্য কেমন অসাধারণ উপদেশদাতা প্রেরণ করেছেন! যিনি মানব প্রকৃতির সূক্ষ্মতা ও কোমলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন এবং স্বীয় দাসদের সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতির প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর এসব মনোরম আচরণ দেখে বুকের মাঝে মন আনচান করে এবং মুগ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া হৃদয় থেকে অবলীলায় এ আওয়াজ উঠে যে, আমাদের প্রাণ, আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের সন্তানসন্ততি তোমার পদতলে উৎসর্গিত। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার প্রতি লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম। হে সেই সত্তা! যার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের সমুদ্র ছিল কূলকিনারাহীন ও চিরস্থায়ী। হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনার প্রতি লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম। আকাশ ও পৃথিবীর এক-অদ্বিতীয় খোদার কসম! আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মাঝে তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তোমার মতো কেউ ছিল না, কেউ নেই এবং কেউ হবেও না। **{খুতবাতে তাহের, তাকারীর জলসা সালানা কবল আয খিলাফত ফরমুদাহ্ সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.), পৃ: ৩৬৪ থেকে ৩৬৬, তাহের ফাউণ্ডেশন কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রকাশিত}**

হযরত হামযা (রা.)'র স্মৃতিচারণে মহানবী (সা.)-এর সেই উত্তম আদর্শেরও উল্লেখ হয়ে গেল। এটি এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে।

অন্য যে কয়েকজন (সাহাবীর) স্মৃতিচারণ বাকি আছে তাদের উল্লেখ আগামীতে করবো, ইনশাআল্লাহ্।

পরশু থেকে নববর্ষও শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। দোয়া করুন! আল্লাহ্ তা'লা নতুন বছরে সকল কল্যাণ নিয়ে আসুন এবং তাঁর সকল কল্যাণে আমাদের ভূষিত করুন। জামা'তের জন্যও এটি সব দিক থেকে কল্যাণময় হোক। শত্রুর সকল ষড়যন্ত্রকে আল্লাহ্ তা'লা ধূলিস্যাৎ করে দিন। এছাড়া বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জামা'তগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের তুলনায় অধিক হারে নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের সৌভাগ্য দান করুন। **একই সাথে সার্বিকভাবে বিশ্ববাসীর জন্যও দোয়া করুন,** যুদ্ধবিগ্রহ থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের রক্ষা করুন। পরিস্থিতি ক্রমান্নয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে আর ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত। কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। সবাই নিজেদের স্বার্থের চিন্তায় ব্যস্ত। আল্লাহ্ তা'লাই দয়া করুন। **এছাড়া নিজেদের নির্যাতিত ভাইদের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন,** আল্লাহ্ তা'লা যেন আগামী বছর সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার থেকে আহমদীয়া জামা'তকে সুরক্ষিত রাখেন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ জানুয়ারি, ২০২৩, পৃ: ৫-১০)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)